প্রথম অধ্যায়

— বাংলা নাটকের প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক নাটক রচনার পূর্বেতিহাস —

কলাবিদ্যার ইতিহাসে 'নৃত্য'কেই প্রাচীনতম কলা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 'নাটক' কথাটির উৎপত্তি 'নৃৎ' ধাতু থেকেই। 'নৃত্য' হল—মনের আনন্দ ও আবেগের ভঙ্গি ময় প্রকাশ। নৃত্যধারার ক্রমিক বিবর্তনেই নাটকের উৎপত্তি। বাস্তব জীবনের চলমান ঘটনাবলীর যথাযথ অনুকরণ প্রবৃত্তিই এর পিছনে সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। সাহিত্য তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে 'ভারতীয় নাটক' একান্ত ভাবেই 'নৃত্য-কলা'-জাত।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ তৃতীয়থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ। নাট্যচর্চা তখন ছিল শুধুমাত্রই রাজন্যবর্গ ও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। সাধারণ মানুষের কোন ইতিহাস বা ভূমিকা এর মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের বাইরে প্রাচীন গ্রীসে নাট্যচর্চায় সাধারণ মানুষের ভাব ও বৈশিষ্ট্যই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নাট্য প্রদর্শনেও তাদের সমবেত ও সক্রিয় ভূমিকাই ছিল বেশী। প্রাচীন ভারতীয় নাটক তথা সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যশালা ছিল বৃহত্তর জনজীবন বিচ্ছিন্ন। নাট্যকারদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পৃষ্ঠপোষক রাজন্য পরিবার ও রসজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদের তৃপ্তিসাধন। এই নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত ছিল মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত।

নাট্যাভিনয় ইসলাম ধর্ম-বিরোধী, তাই এদেশের মুসলমান শাসকেরা শিল্প ও সাহিত্যের অন্যশাখার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও নাট্যকলায় কোনো উৎসাহই দেননি। ফলে রাজানুগ্রহ বঞ্চিত নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়চর্চা স্বাভাবিকভাবেই যবনিকার অন্তরালে নির্বাসিত হল। তবে নাট্যরসের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে লালিত হয়ে ভিন্ন আঙ্গি কে মুক্তি পেয়েছিল। যাত্রা, কথকতা, সং ইত্যাদির সহজ ও সুলভ পরিবেষন নাট্যমোদী জনসাধারণের তৃপ্তি নিবারণ করেছিল। আঙ্গিক ও পরিবেষন-কলায় নাটকের সঙ্গে এগুলির বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। অভিনয়ের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট রঙ্গশালারও প্রয়োজন ছিল না। চতুর্দিকে দর্শক-আবেষ্টনীর মাঝে খোলা উন্মুক্ত মঞ্চে এগুলির অভিনয় হোত।

অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলার 'নব জাগরণের' যুগ। দীর্ঘ মুসলমান শাসনের অবসান

ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা চেতনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালীর চৈতন্যলোক এক নব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমাজ, দর্শন, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এই সোনার কাঠির আলোকস্পর্শ নতুন চেতনার জন্ম দিল। দীর্ঘ নির্বাসনের পাষাণ দুয়ার ভেদ করে বাংলা নাটকও নবোচ্ছ্বাসিত রসধারায় উৎসারিত হল। নাট্যরসের সেই অমৃত সুধার প্লাবনে নাট্য-রস পিপাসু বাঙালীর আকণ্ঠ তৃষ্ণার তৃপ্তি ঘটল।

নাট্যামোদী ইংরেজ এদেশে শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিভিলিয়ানদের মনোরঞ্জনার্থে নাট্যশালা স্থাপন করে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে। এই বিদেশী রঙ্গালয়গুলিতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখার জন্য আলোকপ্রাপ্ত দেশীয় অভিজাতগণ আমন্ত্রিত হতেন। নব-আঙ্গিকের এই নাট্যকলা স্বভাবতঃই শিক্ষিত বাঙালীকে আকর্ষণ করল। যদিও সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল এর আস্বাদ, তথাপি বাঙালীর নাট্যচর্চা বা রঙ্গালয় স্থাপনের আগ্রহের সূচনা এখানেই। বাঙালী ধনী-অভিজাতরা নিজ নিজ গৃহে অস্থায়ী রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত করে নাট্যাভিনয় শুরু করলেন। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগ 'শখের নাট্যশালা'র যুগ নামে পরিচিত। এই যুগে মৌলিক বাংলা নাটকের অভাব থাকায় ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হতে থাকে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা স্বভাবতঃই মৌলিক বাংলা নাটকের চাহিদা বৃদ্ধি করল। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেরণাতেই ধীরে ধীরে বাংলা-নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের যথার্থ সূচনা হয়।

প্রাথমিক পর্বে বাংলা নাটকের স্বনির্ভরতা ছিল না। হয় সংস্কৃত, নয় পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদের উপর ভর দেওয়া ছাড়া তার উপায় ছিল না। যদিও সেগুলি ছিল নিতান্তই দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর অনুবাদ। কিন্তু যেদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি সংগৃহীত হল সেদিন শুধু পৌরাণিক আদর্শের আকাঙ্ক্ষিত রূপায়ণ নয়— সামাজিক ভাব বিপ্লবের আলোড়ন এবং জাগ্রত মানস চেতনার গতি সংঘাত নাটকের কেন্দ্রীয় প্রাণবস্তুতে পরিণত হল।

সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এইসময় জাতির রাজনৈতিক জীবনও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহ, দরিদ্র ও উপায়হীন কৃষক শ্রেণীর নীলবিদ্রোহ বাঙালীর অন্তর্জীবনে এক তীব্র অগ্নিদাহ সৃষ্টি করল। ফলে কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে মুক্তিকামী মানুষের এক অনস্ফুট জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটল। অবিসংবাদিত দেশপ্রেমের প্রেরণায় কবি সাহিত্যিকদের ইতিহাস সচেতনতারও উন্মেষ ঘটল। কবি ঈশ্বরগুপ্ত যেমন পূর্ব-কবিদের পূনর্মূল্যায়ণে নতুন-পুরাতনের সন্ধি রচনা করলেন, তেমনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রঙ্গলালও অবান্তর কল্পনাকে বর্জন করে ঐতিহাসিক পটভুমিকায় দেশ প্রেমকেই কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত রঙ্গলাল আপন অবচেতনে যে পরাধীনতার অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন, তারই তাগিদে রাজপুত-বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে বাঙালীকে দেশগৌরবে উদ্বুদ্ধ করলেন। উপন্যাস জগতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ইত্যাদি ঔপন্যাসিকগণ দূর অতীতের গৌরবময় ইতিহাসকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করে তার উপর আপন দেশভক্তির অনুরঞ্জন লিপ্ত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে উদ্দীপ্ত স্বদেশ প্রেম ও জ্বলন্ত বিশ্বাস এক মহিমময় আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করল।

> "প্রেমিক যেমন সমগ্র বাস্তব-জগৎকে নিজ আদর্শ স্বপ্নের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করে, কবি ও স্বদেশ প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রও অতীত ইতিহাসকে দেশভক্তির প্রবল শিখায় গলাইয়া, কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, তাহার উপর নিজ বিশাল রাজোচিত মনের প্রভাব মূদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।"
>
> (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪২)

নাট্যসাহিত্যে এই দেশপ্রেম মুক্তি পেয়েছিল কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনাকে আশ্রয় করে নয়, সমাজের দূষিত ব্যাধিসমূহকে কঠোরহস্তে নির্মূল করবার সংকল্পে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, দুশ্চরিত্রতা, নব্যবাঙ্গালীর উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলিই তৎকালীন নাট্যকারদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। অতীতের গৌরবময় কাহিনীর নাট্যরূপের মধ্য দিয়ে জাতির সুপ্ত দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটল মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রচিত 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটকের মধ্য দিয়ে। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জন্ম-পূর্ব-লগ্নের ইতিহাস সংক্ষেপে এই। এরপর ক্রমবিকাশের পথ অতিক্রম করে ১৯০৫ খৃ. তার পূর্ণবিকাশ প্রাপ্তি। সেই ইতিহাস আলোচনার আগে বাঙালীর জীবনে জাতীয় চেতনা ও স্বদেশবোধ জাগরণের পটভূমিকাটুকুও আলোচনা করা উচিত।

—ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্তির জন্য ১৯০৫ অবধি অপেক্ষার কারণ ও ইতিহাস—

আগেই বলেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা বাঙালীর জীবন চেতনার পটবদলের পটভূমি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তাশূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই তাকে জাতীয় চেতনাহীন, স্বার্থদীর্ন, বিভেদ পরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারীতে পরিণত করেছিল। আর এই অচেতনতার গভীর কৃষ্ণ পথেই বিদেশী ইংরেজদের এদেশে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উনিশ শতকের ঊষালগ্নে পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদী জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার, মানবহিতবাদী বিভিন্ন পরিকল্পনা, অতীত ইতিহাসের পূনর্মূল্যায়ন ইত্যাদি বাঙালী জাতির জড় চিন্তার জগতে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই অনিবার্য ফল জাতির মননে স্বদেশবাদের সূত্রপাত।

সাহিত্যের নানাবিধ শাখার মধ্যে একমাত্র 'নাটক'ই জাতীয় জীবনের সংহত রূপটিকে ধারণ করতে সক্ষম। বিশ্বের সমস্ত দেশে নাট্যসাহিত্য তখনই চরম উৎকর্ষের সীমা ছুঁয়েছে যখন জাতীয় জীবনও নানা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে উন্নতির চরম শিখর স্পর্শ করেছে। বাংলাদেশে যে 'নবজাগরণ' ঘটেছিল তা মূলতঃ আশ্রয় করেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এবং একে ঘিরেই তার বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি ঘটেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে আশ্রয় করেই প্রথম স্বজাতি ও স্বদেশচেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটল। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার ইত্যাদি নানান বিষয়ে তাঁরা যেমন দেশবাসীর সামনে নতুন

দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে লাগলেন, তেমনি অন্যদিকে জাতি-হিতৈষণা-বৃত্তির ব্যাপ্তির তাগিদেই নাটক ও নাট্যশালার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

> "এ দেশে যখন নাট্যশালার সৃষ্টি হয় তখন দেশে একটা অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরজী শিক্ষা, ইংরেজী ভাব, ইংরেজী চিন্তা, ইংরেজী সভ্যতা, ইংরেজী আচার ব্যবহার, নিষ্ঠা বাঙ্গলার অচলায়তনের শতমুখী যে শিকড়, তাহাকে শতদিক হইতে নাড়াইয়া দিয়াছে ও বাঙালীর জীবনের ধারা এই সময় হইতে সকলদিকেই বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সাহিত্যও এই সময়ে নবকলেবর ধারণ করে"
>
> (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় - 'বাংলা নাটক ও গিরিশযুগ' রূপ ও রঙ্গ, ৩রা আশ্বিন ১৩৩২)।

জাতীয় জীবনের এই পালাবদলের ইতিহাস শুধুমাত্র সামাজিক বা পৌরাণিক নাটককেই আশ্রয় করল না - জাতির অতীত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলো সেই সব অধ্যায় যার মাধ্যমে জাতীয় চেতনায় নব-উন্মাদনা জাগ্রত করা সম্ভব। এর ফলে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ইতিহাস উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করল। তবে যথার্থ ইতিহাসবোধের জন্য জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে উদার সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তার একান্ত অভাব অষ্টাদশ শতকে জাতির মানসিক অবনমনের প্রধান কারণ ছিল। নবজাগরণের উদ্বোধন সংগীতের অন্যতম সুর ছিল ইতিহাস চিন্তার পুনরুদ্ধার। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের স্বদেশমুক্তি আন্দোলনের সমস্ত ঋত্বিকগণই এই ইতিহাস চেতনাকে অস্বীকার করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যেই বলেছিলেন—

> "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। ..... নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। .... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।"
>
> (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় খন্ড, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা')

ভারতবর্ষে রাজকীয় বৃত্তান্ত বা ধর্মীয় ও সামাজিক বৃত্তান্তের অভাব না থাকলেও, আধুনিক দৃষ্টি অনুসারে 'ইতিহাস' বলতে যা বোঝায় তা অতীতে এমনকি ইংরেজ আমলেও

রচিত হয়নি। ঐতিহাসিকেরা মূলতঃ শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই এদেশীয় ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ফলে নিরপেক্ষ ইতিহাস বা সাধারণ মানুষের ইতিহাস কোনটাই রচিত হতে পারে নি।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ইতিহাসের ঘটনাবলী নাট্যআঙ্গিকে বিধৃত হয়। ঐতিহাসিক সত্য বা তথ্যকে অবিকৃতভাবে অনুসরণ করার কোন দায় না থাকলেও, ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাকে এর রসটুকুকে আশ্রয় করতেই হয়। এর সঙ্গে মিলিত হয় নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য ও চেতনা। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে তাঁর বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। তাই ঐতিহাসিক নাটক হল সেই জাতীয় নাটক, যা জাতীয় বিপর্যয়ের দিনে অতীতের গৌরব কাহিনীকে জীবনের স্পন্দন দিয়ে বর্তমানের ব্যঞ্জনায় ভূষিত করে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত করে। এই মূল প্রেরণার প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকও সৃষ্টি হয়েছে বাইরের সঙ্কট-সংঘর্ষ ও অন্তরের জাতীয়তাবোধের তাগিদে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের যুগকেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের 'সুবর্ণযুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ই ঐতিহাসিক নাটক নূতন তাৎপর্যে ব্যাপ্তি পেয়েছিল। যদিও স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী জীবনে 'নব-চেতনার-জাগরণ' কোনো রাতারাতির অভিনব ঘটনা নয়, দীর্ঘদিন ধরেই চলেছিল এর প্রস্তুতি। কারো কারো মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ ছিল এই জাগরণের নীরব উদ্‌যোগপর্ব। নানা প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান এই জাতীয় চেতনার পূর্বাভাসকে সূচিত করেছিল। নাট্যকারেরাও পাশ্চাত্ত্যের জীবনমুখী উন্নত দর্শনচিন্তা ও বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস-অধীত জ্ঞানকে আপন মননে গ্রহণ করে এক নতুন জীবনবোধে উন্নীত হন। এই নতুন জীবনবোধই স্বদেশ ও জাতি প্রেম সম্পর্কে এক গভীর প্রতীতি দান করেছে। তাঁরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাদেশিকতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনাকে দেশবাসীর চিত্তে পৌঁছে দিতে জাতির পূর্ব-ইতিহাসের গৌরবগাথাকেই আশ্রয় করতে হবে এবং এর মাধ্যম হবে নাটক ও নাট্যশালা। তাই শুধুমাত্র জাতীয় চেতনা জাগরণের উদ্দেশ্যেই তাঁরা কলম ধরলেন

না, স্বরাজ গঠনের মহান দায়িত্ব সম্পর্কেও জাতিকে সচেতন করতে চাইলেন। তাই ইতিহাস অনুশীলনে গৃহীত হলো উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচারিত হলো বিভেদনীতির ঊর্ধ্বে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন-ভাবনা।

বস্তুতঃ এই জাতীয়তাবোধ এবং তা থেকে উৎসারিত ইতিহাসচেতনা বা অতীতের গৌরবময় উত্তরাধিকারের আকাঙ্ক্ষা বাংলা নাট্যসাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তার জন্ম লগ্ন থেকেই। তবে ১৮৭২ খৃ. 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দেখা গেল সচেতনভাবে ইতিহাসকে নাটকের বিষয়ভুক্ত করবার প্রয়াস। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরলাল রায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নাট্যকার অতীত ভারতের গৌরবগাথাকে নাটকের প্রতিপাদ্য করলেন। অবশ্য এই সময়ের নাটকে রাজনৈতিক চেতনা বা ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদের পরিচয় নেই। এই সময়কার স্বদেশ অনুভাবনা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পথেই ধাবিত হয়েছিল। বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

তারও আগে মধুসূদন দত্ত রচিত প্রথম ঐতিহাসিক ও ট্রাজিডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র কথা ভুললে চলবে না। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এটিই প্রথম বাংলা নাটক। এরপর মধুসূদনও যেমন আর কোন ঐতিহাসিক নাটক লেখেননি, তেমনি ১৮৭২ খৃ. পর্যন্ত যে কটি অনুল্লেখ্য ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়েছিল তারাও অঙ্গুলিমেয়। তথাপি ইতিহাসের বিষয়বস্তু (যা ঐতিহাসিক নাটকের মূলমন্ত্র) এবং জাতীয় চেতনার অস্ফুট আবেদন এই 'কৃষ্ণকুমারী' তেই প্রথম পাওয়া যায় বলে এই যুগকেই ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম পর্ব বলতে দ্বিধা করা উচিত নয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেমন কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদিতে ইতিহাসের কাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আশ্রয় পেয়েছিল। তবে অপরিণত ও অস্পষ্ট জাতীয়তাবোধের জন্যই এ যুগের সবরকম ইতিহাসাশ্রয়ী রচনায় পাওয়া যায় এক অনতিব্যক্ত জাতীয় চেতনা।

বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকটি ফরমায়েসী রচনা হলেও এর জন্ম-প্রেরণার কৃতিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনের 'রিজিয়া'

নাটকের পরিকল্পনা তার প্রমাণ। মধুসূদনের স্বাজাত্যবোধ শুধু নাটকটির কাহিনী নির্বাচনে বা চরিত্রসৃষ্টিতে কাজ করেনি, পূর্বপুরুষদের কীর্ত্তি স্মরণ করে ক্ষয়িত শক্তি রাজা ভীমসিংহের অন্তর্জ্বালার অভিব্যক্তিতেও কাজ করেছে। অতএব স্বদেশবোধের প্রথম প্রকাশে 'কৃষ্ণকুমারী'র দাবি অবশ্য স্বীকার্য।

'কৃষ্ণকুমারী' তথা ঐতিহাসিক নাটকের উন্মেষ যুগে (১৮৬১- ৭২) আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়নি মূলতঃ জাতীয় রঙ্গমঞ্চের অভাবে। 'শখের থিয়েটারে'র পৃষ্ঠপোষক নব্যধনীদের মধ্যেও ছিল জাতীয়চেতনার একান্ত অভাব। পাশ্চাত্য শিক্ষা-লব্ধ স্বদেশচেতনাকে প্রাচীন নাট্যরীতির বন্ধনে ধরার ক্ষেত্রেও নাট্যসংস্কারের সায় মেলেনি। আবার এই নতুন রূপকল্পকে বিন্যস্ত করার জন্য যে নতুন নাট্যকাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজন, উপযুক্ত সৃজনী প্রতিভার অভাবে তাও ছিল সুদূর-পরাহত। তাই এই পর্বে মধুসূদন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো নাট্যকারের সাফল্য অলক্ষ্যবর্তীই থেকে গেছে। তবে জগবন্ধু ভদ্রের 'দেবলা দেবী' (১৮৭০), প্রাণনাথ দত্তের 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' (১৮৬৭) ইত্যাদি কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে স্বদেশবোধের কিছু কিছু পরিচয় থাকলেও যথার্থ ঐতিহাসিক নাটকের বিকাশ হয়েছে বলা যাবে না। বরং বিকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। এই বিকাশ যথার্থ সূচিত হয়েছে ১৮৭২ খৃ. 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল বিত্তহীন কৃষকদের মধ্যে। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী সমাজ এর সমর্থনে সংঘবদ্ধ হয়। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের আন্তরিকতায় ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে রচিত হল প্রথম গণনাট্য 'নীলদর্পণ'। বাঙ্গালীর স্বাধিকারবোধের প্রথম আত্মপ্রকাশ এতেই। ১৮৭২ খৃ. 'সাধারণ নাট্যশালা'র আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এই জাতীয় স্বাধিকারবোধকে সম্মান জানিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৭২ খৃ. কে ধরে একটি নূতন যুগের সূচনা রেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে। যে স্বাজাত্য বোধ 'কৃষ্ণকুমারী'তে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাই-ই পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকের মূল সুর হিসেবে ধ্বনিত হতে থাকল। এরই সঙ্গে যুক্ত

হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের জাতীয় আন্দোলন গুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব। নাট্যচর্চাও অভিজাতদের শৌখিনতা থেকে মধ্যবিত্তের আগ্রহে ও আকাঙ্ক্ষায় মুক্তি লাভ করল। স্বদেশী আন্দোলনের হোতারা নানানভাবে বাংলানাট্য জগতকে প্রভাবিত করলেন। এই অধ্যায়ে জাতীয় আন্দোলন ও বাঙলা নাট্যজগত একে অপরের পুষ্টি সাধন করেছিল। ন্যাশনালিটির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের নামকরণও হয়েছিল 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। তবে জাতীয় আন্দোলনের এই পর্ব ছিল মূলতঃ হিন্দুকেন্দ্রিক। হিন্দু-মুসলমান মিলিত কোন যৌথ আন্দোলন সংস্থার খোঁজ পাওয়া যায় না। তবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্থার পরিচয় আছে। জাতীয় আন্দোলনের এই হিন্দু প্রবণতা তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটককেও প্রভাবিত করেছিল। যবন-নিন্দা সেই সময়ের প্রায় সবকটি ঐতিহাসিক নাটকেই দেখা গেছে। তবে কম-বেশী ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল।

১৮৭২ এ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে ঐতিহাসিক নাটকের প্রস্তুতিকাল বলা হয়েছে এবং এরপর থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত সময় সীমা এর বিকাশকাল। এবং এই বিকাশপর্বে বাংলা নাটকে যে জাতীয়-আন্দোলনের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়েছে তাতেই উদ্বেলিত হয়েছে সেই সময়কার ঐতিহাসিক নাটক। এই পর্বে অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। যুগধর্মানুযায়ী তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে যে স্বদেশপ্রীতি লক্ষিত তা মুখ্যতঃ ইতিহাসাশ্রয়ী, সমকালীন যুগের স্বাদেশিক ভাবধারা ইতিহাসের নির্মোকে তাঁর নাটকে উপস্থিত। তিনি এই যুগোচিত ভাবধারা ও ইতিহাসচেতনার সঙ্গে আপন ঐতিহাসিক সচেতনতা ও ইতিহাসচেতনার ঈপ্সার সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৮৬৭ খৃ. যে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হয় সেই মেলা থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ বোধের দীক্ষা। ফলে তাঁর নাটকগুলিতে এই অঙ্কুরিত জাতীয় চেতনাই ইতিহাসের অতীত পটভূমিকায় পল্লবিত হয়েছে। 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' এবং স্বপ্নময়ী'র মধ্যে প্রথমটিতে মুসলমান পূর্ব যুগের কাহিনী গৃহীত এবং পরের তিনটিতে মুসলমান

আমলের কাহিনী বিবৃত। কোনো নাটকেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ছবি বা এই সময়কার ভারতবাসীর দুর্দশা বা প্রতিবাদের চিত্র অঙ্কিত নয়। এর একমাত্র কারণ জাতীয় চেতনার কোনো পরিণত বা সুস্পষ্ট রূপ জ্যোতিরিন্দ্র-মানসে ছিল না। তিনি যেমন উগ্র-হিন্দুজাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে পারেন নি, তেমনি মুসলমান সমাজের যথার্থ স্থান সম্পর্কেও সংশয়িত ছিলেন। এই দ্বিধাগ্রস্থতাই তাঁর নাটকে একদিকে যেমন হিন্দু মানসিকতাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছে, তেমনি বৃহত্তর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানকে সহজ স্বীকৃতি দান করেছে। জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ যুগের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় ন্যাশনালিজ্‌মের আদর্শ যার মূল কথা ন্যায়-অন্যায় পাপ পুণ্যের বিচার নয় শুধুমাত্র একটি কর্তব্য-দেশের স্বাধীনতা রক্ষা। এরই সঙ্গে মিলিত হয়েছিল হিন্দুজাতীয়তাবাদ। পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনে অবশ্য অনেকের মনেই এই দ্বিধা দেখা দিয়েছিল যে, শুধু হিন্দু নিয়ে অখন্ড ভারতবর্ষের কল্পনা করা যায় না। সমাজের একটি অংশ জুড়ে যে অন্য সম্প্রদায়ের বাস তারাও ভারতবাসী। ধর্মের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও এদের বাদ দিয়ে সামগ্রিক আন্দোলন সফল হতে পারে না। অতএব যথার্থ মর্যাদায় এদের স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব এ সম্পর্কে আন্দোলনের নেতারাও স্পষ্ট কোন পথ দেখাননি। হয় নতুন অনুভূতির ভাবাবেগে শুধুই উদ্বেলিত হয়েছেন, নয় হিন্দু-জাতীয়তাবোধে মগ্ন থেকেছেন। এই মানসিকতারই ছায়া পড়েছে রঙ্গালয়ে, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি এই যুগ-মানসেরই ফসল তাতে সন্দেহ নেই। তবে এগুলির উপর তাঁর আপন-মনোভাবের প্রভাবও সহজে লক্ষ্য করা যায়। স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে তাঁর নাটকে দেশের অতীত ইতিহাসের গৌরববাণীকে চয়ন করে সমকালীন যুগবাণীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথেই মোটামুটি ঐতিহাসিক নাটকের ২য় পর্বের অবলুপ্তি বলা চলে। ১৮৮২ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে এর পর অনুল্লেখ্য সামান্য কটি ঐতিহাসিক নাটক লিখিত হয়েছে। হরলাল রায়ের 'বঙ্গের যুগাবসান' ও উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'বীরবালা' বা 'মহারাষ্ট্রের কলঙ্ক' ইত্যাদি নাটকে সহজাত ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব বা স্বদেশ চেতনার অভাব

সেগুলিকে স্থায়িত্ব দিতে পারে নি। এরপর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে ঐতিহাসিক নাটককে প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল তার সুবর্ণযুগের অপেক্ষায়। ১৯০৫ খৃঃ পর্যন্ত ঐতিহাসিক নাটকের এই প্রতীক্ষার পিছনে প্রধান কয়েকটি কারণ ছিল। এক, নাট্যজগতের যে একক ব্যক্তিত্ব এই সময় বাংলা নাটক ও নাট্যশালাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তিনি নাট্যস্রষ্টা, অভিনেতা ও পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথমাবধি তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। দুই, জাতীয়তাবোধের ইউরোপীয় আদর্শের প্রতি বাঙালী শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের দ্বিধাগ্রস্থতা ও অতৃপ্তি। তিন, এই সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারে বাঙলাদেশে ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা, চার, ১৮৭৬ এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা নাটকের মাধ্যমে জাতীয়জাগরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা। ফলে ইতিহাসের বিষয় নিয়ে কখনো সখনো নাটক লেখা হলেও ধর্মভাব এবং ভক্তির প্রাবল্যে তাতে সময়ে সময়ে ইতিহাসের তথ্য দূরে থাকুক পটভূমিকাটুকুও লুপ্ত হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি বিরূপতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর প্রথম জীবনে পৌরাণিক নাট্যকার হিসেবেই চিহ্নিত। তিনি বিশ্বাস করতেন— 'ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্মে ধর্ম' - অতএব নাটককে সর্বজনপ্রিয় ও নাট্যমঞ্চকে লাভজনক ভাবে পরিচালিত করার জন্যে পৌরাণিক নাটকই যথার্থ। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমকালীন ধর্ম-আন্দোলনের প্রভাব। এর প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করলেন, নবীন সেন ''ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'' লিখলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মতত্ব আলোচনায় ব্রতী হলেন, এমনকি কিশোর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধর্মআন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলম চালনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত আবেগপ্রধান ধর্মবোধ সেই সময়কার বাঙালীর এই পরিবর্তিত মানসিকতার সঙ্গে যথাযথভাবে মিলে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক নাটকও যেন সময়প্রেক্ষিতে পৌরাণিক নাটককে জায়গা দিয়ে সরে দাঁড়াল।

পৌরাণিক নাটক ছাড়া সমসাময়িক নানান রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সময় 'রাজনৈতিক নাটক' আখ্যাত এক ধরণের নাটক লেখা হতে থাকে। এগুলির দ্বারা জাতীয় আন্দোলনকে প্রকাশ করা অনেক সহজ হল। জনপ্রিয়তাও এল দ্বিগুণ। কিন্তু এই

উদ্দামতা আকস্মিক স্তব্ধ হয়ে গেল শাসকের খড়্গাঘাতে। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' বা 'হনুমান চরিত্র', 'police of pig and sheep', 'শরৎ সরোজিনী' ইত্যাদি নাটক তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে নাট্যজগতকে শাসন করার তাগিদ অনুভব করায়। এরও আগে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের সময় থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হতে থাকে। শুধু শাসক শক্তিই নয়, দেশীয় একদল উন্নাসিক নীতি বাগীশ এবং সরকারী প্রসাদভুক্ত স্তাবকেরাও নাটকের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে অতি সহজেই বঙ্গ-নাট্যজগতে শাসক শক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটল ১৮৭৬ এর মার্চ মাসে 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ' আইন প্রয়োগের দ্বারা।

পরাধীন দেশের নাটকের দুই প্রধান শত্রু পিউরিটান উন্নাসিকতা ও বিদেশী শাসন। এরা একে অপরকে আশ্রয় করে, সমৃদ্ধ করে সেই নাট্যশালার সূচনার যুগ থেকে বাংলা নাটকের মুখ বন্ধের নানান প্রয়াস করেছে এবং পুরোপুরি সফলতা পেয়েছে ১৮৭৬ এর আইন প্রয়োগে। ফলে পরবর্তী বাংলা নাটক ও মঞ্চ স্বদেশ ও স্বকাল ভাবনা থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে ঈশ্বর প্রেমে নিমীলিত নেত্র হলো। ধর্মমুখী বা রঙ্গতামাশামুখর হয়ে উঠল বাংলা নাট্যমঞ্চ। এরপর ১৯০৫ এর 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের ব্যাপক জাতীয়তার জোয়ার নাট্যজগতকে আবার স্বদেশভাবনার ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত করে তোলে।

এই সময়প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-নাট্যমানসের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংশ্রবে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর যৌবন অতিবাহিত। এর সঙ্গে মিলেছিল অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রভাব। তবে উগ্র বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধকে কবি মানস কখনই প্রশ্রয় দেয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রমত্ততা অপেক্ষা আত্মশক্তির উদ্বোধনেই তাঁর পক্ষপাত ছিল। সুতরাং বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের চিত্রাঙ্কন রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হলেও আবাল্য ইতিহাসের সাধনায় প্রাপ্ত সূক্ষ্ম ও গভীর ইতিহাস চেতনা এবং জাতীয় চেতনার নিজস্ব অনুভূতি সেগুলির কোনটিকে প্রচলিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঐতিহাসিক নাটকের তালিকাভুক্ত করতে পারেনি। তাই ঐতিহাসিক নাটক বলতে আদতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তা একটিও রচনা

করেননি। বস্তুতঃ তাঁর নাটক বস্তুসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্যের পঞ্চাঙ্ক নাটকের অনুসরণমাত্র নয়, এতে তাঁর স্বকীয় নাট্যচেতনা আভাসিত। ইতিহাসের ছদ্ম আবরণে তিনি যে কটি নাটক রচনা করেছেন তাতে তথ্যের চেয়ে ঐতিহাসিক সত্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী। যদিও তাঁর পরিণত বয়সে রচিত কিছু নাটকে যে গভীরতর ঐতিহাসিক বোধের পরিচয় আছে তার ফলে কোনো কোনো নাট্যসমালোচক সেগুলিকে ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদাই দিয়ে থাকেন। কারণ ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের ব্যক্তি বা ঘটনা না থাকলেও তীক্ষ্ম ঐতিহাসিকবোধই তাকে সার্থক করে তুলতে পারে।

যাইহোক, ঐতিহাসিক নাটকের সাময়িক অবলুপ্তি ঘটেছিল এই ভাবে। এর পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

— স্বদেশী আন্দোলনের সাহিত্যিক মুখপত্র বা জনজাগরণের মাধ্যম হিসেবে ঐতিহাসিক নাটকের ভূমিকা —

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে নতুন ও প্রবলতর প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল এবং বাংলা নাট্যজগতেও জাতীয় চেতনার মুখপত্র ঐতিহাসিক নাটক স্ব-মহিমায় বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে বিকশিত হল। শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্র জীবনী" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "বাঙলা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হওয়াতে সাহিত্যিকগণ নূতন ধরণের নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন। বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনে যে নূতন আত্মচেতনা আসে, তাহা বিংশ শতকের শুরু হইতে এমনকি তাহার পূর্ব্ব হইতেই সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল"।

রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' এর প্রতাপাদিত্যের অনুসরণে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' এবং 'বঙ্গের শেষ বীর' ১৯০৫-এর আগেই অভিনীত হয়ে এই জাতীয় নাটকের চাহিদা সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৩-এ ক্ষীরোদপ্রসাদের 'শ্রীপ্রতাপাদিত্যে'র অভিনয় শুরু হয়। কিন্তু ১৯০৫-এ দেশাত্মবোধের জাগরণে এর ব্যাপক অভিনয় দেশের সর্বত্র প্রদর্শিত হতে থাকে। সুতরাং এ যুগের জাতীয় আন্দোলনেরই সাহিত্যিক পরিণতি যে ঐতিহাসিক নাটক তা স্বীকার করতেই হবে। এই যুগটিকে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ বা পরিণত পর্ব বলা যেতে পারে। শুধু নাট্যজগত নয় সাহিত্যের সকলক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাব পরবর্তীকালে এটিকে 'জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছে। সংযত-স্বভাব রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর উন্মাদনাকে ঠেকাতে পারেননি, নানান লেখায় ও উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উদ্দীপনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এযুগের ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। তাই অতীত থেকে বীরত্বের কাহিনী ও বীরচরিত্র সংগ্রহ করে নাটক লেখা হতে থাকল। এবং স্বভাবতই প্রচুর অতিরঞ্জন এমনকি ঐতিহাসিক চরিত্রেরও সময়ানুযোগী পরিবর্তন হতে লাগল। বীর নেতা বা রাজার শৌর্য এবং স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রাম, কয়েকটি উত্তেজনাময় দৃশ্য, নারীর প্রেম ও তার করুণ পরিণতি এই রকমই কটি উপাদানে তৈরী ঐতিহাসিক নাটকের যে ছাঁদ সৃষ্টি হয়েছিল, এ যুগের নাট্যকারদের মধ্যে তার অনুসরণ থাকলেও একটা ব্যাপারে বৈষম্য দেখা গেল—তা হল হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং মুসলমান চরিত্রসৃষ্টির উদারতায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলমান বিরূপতা যেমন এ যুগের নাটকেও দুর্লভ নয়, তেমনি হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শও এ যুগের ঐতিহাসিক নাটকে প্রথম ও প্রধান প্রবর্তনা। সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের চারিত্রিক বদলই ঐতিহাসিক নাটকে এই নব-প্রবর্তনার কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয়তার প্রভাব এ যুগের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠার ফলে ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিভার অনিবার্যতা গৌণ হয়ে পড়েছিল। জাতীয়তার আন্তরিক উপলব্ধির চেয়ে বাক্‌সর্বস্ব উচ্ছ্বাসই নাট্যকারদের সৃষ্টিতে বড় হয়ে ওঠে। স্বাজাত্যবোধ জীবনের অন্যতম অনুষ্ঠানেই সীমায়িত

থাকল, অস্থিমজ্জায় গভীরভাবে মিশে গেল না। ফলে শাশ্বত শিল্পের প্রকাশনা নিয়ে খুব কম ঐতিহাসিক নাটকেরই দেখা মিলল। সম্মিলিত প্রয়াসের মূল্যেই তাই এ যুগের ঐতিহাসিক নাটকের মূল্য নির্ধারিত। কোন বিশেষ নাট্যপ্রতিভার বিচার এক্ষেত্রে অবান্তর।

— গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে সমকালীন স্বদেশ আন্দোলনের প্রভাব —

সমকালীন ঘটনার উত্তাপে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ যুগে নতুনভাবে ঐতিহাসিক নাটক লেখায় কলম ধরলেন। ১৯০৬-এ প্রকাশিত হল তাঁর এই পর্যায়ের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদৌল্লা'। এর আগে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী সন্তানদের দেশ প্রেম এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সরল, ত্যাগী জীবনের আদর্শে প্রভাবিত গিরিশ 'প্রতাপসিংহ' কে নিয়ে নাটক লিখতে বসেও বিরত হন দুটি কারণে—এক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐ চরিত্র নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। দুই, রাণাপ্রতাপ চরিত্রে ইতিহাস স্বীকৃত আভিজাত্যের অভিমানের সঙ্গে দেশব্রতী সন্ন্যাস আদর্শের বৈষম্য। যাই হোক তাঁর সৃষ্ট এ যুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলি আপাতভাবে পৌরাণিক লক্ষণ ও ধর্মভাবশূন্য। তবে গিরিশচন্দ্রের নাট্য আলোচনায় এ কথা ভুললে চলবে না যে পুরাণ মানসিকতাই তাঁর নাট্যসৃষ্টির মূল কথা। স্বক্ষেত্র ত্যাগ করে যখনই তিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন তখনই তাতে স্বাভাবিক আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। এবং এর ফলেই তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাফল্য পাননি।

গিরিশচন্দ্রের জাতীয় চরিত্রের আদর্শ ছিল 'শিবাজী'। কিন্তু শিবাজীর অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর নাটকে চিত্রিত হয়নি। তাঁর নাটকে হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্বের কথা থাকলেও তা শুধুই যুগের ধারা অনুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। কোনো গভীর ঐতিহাসিক মনন-সম্বলিত উপলব্ধিতে বিধৃত হয়নি। ফলে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যের সশ্রদ্ধ চিত্রায়ণ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি যথার্থ উপলব্ধির অভাবে দ্বিধা মন্থর হয়ে

পড়েছে। তাঁর 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মীরকাশেম' অপেক্ষা ছত্রপতি শিবাজী'র মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিণত ইতিহাস চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়। তবে শিবাজী চরিত্রসৃষ্টিতে পৌরাণিক অনুষঙ্গটি বারে বারে ফিরে এসেছে এবং বঙ্গভঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রয়াসের মধ্য থেকেও তিনি নাটকের প্রধান চরিত্রের মুখে যবন-নিন্দা ঘটালেন। 'অশোক' নাটকটিতেই গিরিশের মানসিকতা আবার পুরাণে ফিরে এসেছিল। এ যেন একই বৃত্তে বারে বারে ঘুরে আসা, মাঝে শুধু হুজুগে পড়ে স্বভাববিরোধিতা করে ইতিহাসের প্রান্তে উঁকি দিয়ে আসা।

— অমৃতলাল বসুর ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতার সুর —

যে যুগচাহিদা চিরকাল নাট্যকারের রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেই যুগচাহিদাই গিরিশ পরবর্তী প্রায় সব নাট্যকারকেই নিয়ন্ত্রিত করেছিল। নাট্য-জগতে অমৃতলাল বসু তাঁর প্রহসনগুলির মাধ্যমে বাঙালী দর্শককে প্রচুর ব্যঙ্গ-রঙ্গরস পরিবেশন করেছেন। সে যুগের বাঙালীর নবজাগরণের চেতনাতে তিনি উদ্বুদ্ধ হননি, বরং সেগুলিকে বিদ্রূপই করেছেন। অথচ তাঁর তিনটি নক্সা জাতীয় নাট্যপ্রচেষ্টায় সমকালীন দেশাত্মবোধের স্পর্শ অনুভূত হয়।

লর্ড কার্জন ১৮৯৯ সালে কলকাতায় যে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তন করেন তার প্রতিবাদে নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ইত্যাদি আটাশ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন। এঁদের বাহবা দিয়ে 'সাবাস আটাশ' রচিত হয়। 'সাবাস বাঙ্গালী' এই সামাজিক নকসাটিতে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ছবি পরিস্ফুট। এটিকে সামাজিক নক্সা না বলে প্রচারধর্মী রাজনৈতিক রচনা বলা সঙ্গত। এতে দেশের স্বদেশী আন্দোলনের বিশেষতঃ বয়কট আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। চরিত্রগুলি উচ্চ আদর্শে উদীপ্ত। তাদের দিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতাও দেওয়ান হয়েছে। নাটকে সংযোজিত গানগুলিতে দেশাত্মবোধক সুর ধ্বনিত। চুড়িওয়ালি,

ধোপানী, ঘটকী, মুচি সবার গানেই দেশাত্মবোধ জাগাবার প্রচেষ্টা রয়েছে। 'নবজীবন' নামক নাট্যলীলাতেও কাহিনীর ধারাবাহিকতা নেই। তিনটি দৃশ্যে যথাক্রমে কংগ্রেসের ভাল ভাল কাজের বিবরণ, গীত সহযোগে ভারত-লক্ষ্মীর কলকাতা পরিক্রমা ও হিমালয় পর্বতে সিংহাসনারূঢ়া ভারত মাতার সম্মুখে নিদ্রিত ভারতবাসীর ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দেশাত্মবোধক গান নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকটি শেষ হয়েছে 'বন্দেমাতরম্' সংগীত দিয়ে। দেশাত্মবোধের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যই এই গানগুলি নাটকে ব্যবহৃত।

অমৃতলালের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক 'হীরকচূর্ণ'তে একই সঙ্গে তিনি জনমতকে অস্বীকার না করে গাইকোয়াড়ের সমর্থন করেছেন আবার রাজভক্তির প্রাবল্যে তদানীন্তন বৃটিশ কর্ণধার লর্ড নর্থব্রুকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মনে রাখতে হবে- ১৯০৫-এর বঙ্গচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে যে দেশাত্মবোধ ও প্রবল উত্তেজনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সব নাট্যকারেরাই তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন নি। ব্যবসায়ের স্বার্থে সেদিনের সেই নব-চেতনা প্রাপ্ত মানুষের দেশাত্মবোধকে অস্বীকার করে তাঁদের পক্ষে নাটক লেখা সম্ভব হয়নি, কিন্তু রাজভক্তির প্রবণতায় এবং সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের আশায় ব্যবসায়িক মঞ্চ থেকে বিদেশী সরকারের গুণগান না গেয়েও তারা পারেননি।

— ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতার প্রচার —

তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুকূল স্রোতধারাকে অবলম্বন করে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশ চেতনার নব উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়োজনে যে কয়জন নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তবে তাঁর নাটকে রাজনীতির সঙ্গে পৌরাণিক শক্তি-সাধনার সমন্বয় সংঘটিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম

ঐক্য স্থাপন তখনকার আন্দোলনের যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল—ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে তার প্রতিফলন স্পষ্ট। তৎকালীন নেতাদের অনুসরণেই তিনি তাঁর নাট্য-চরিত্রের সংলাপে দেশহিতৈষনার ব্রত প্রচার করলেন। এর ফলে অনেকসময় তিনি ইতিহাস সত্য বা ঐতিহাসিক চরিত্রের অপলাপ ঘটাতেও কুণ্ঠিত হননি। তাঁর সৃষ্ট প্রতাপাদিত্য চরিত্রটি এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁর 'নন্দকুমার' নাটকটির উল্লেখও করা যেতে পারে। ১৮৮৬তে একই বিষয় অবলম্বনে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'নন্দকুমারের ফাঁসি' নামে একটি নাটক লেখেন। যুগভাবনার পার্থক্যে দুটি নাটকের বক্তব্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে নন্দকুমারকে স্বদেশপ্রেমিক রূপে চিত্রিত করেছেন। তাই এতে ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা দেশাত্মবোধের প্রেরণা বেশী। নন্দকুমার হয়ে উঠেছেন জাতীয় বীর—

> "নাট্যকার বাঙালীর সৎ সাহস ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনের সমুন্নত আদর্শ প্রচার করেছেন।"
>
> (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য - পৃঃ ৩৬৭)

মনে রাখতে হবে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ছিল রক্ষণশীল হিন্দুর সামাজিক আধিপত্যের যুগ। নাট্যকার এই নাটকে নায়ক নন্দকুমার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজাকেই সুউচ্চে তুলে ধরেছেন। প্রতাপাদিত্যের চরিত্রসৃষ্টিও সেই একইভাবে স্বদেশবোধের তাড়নায় ইতিহাসের চরম বিপর্যস্ততার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় যখন রাজনৈতিক নেতারা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রচেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে ইংরেজ কূট বিভেদনীতিকে ব্যর্থ করে দিতে সক্রিয়, সেই সময় ক্ষীরোদপ্রসাদও দেশ ও জাতি ব্যতিরেকে অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। তাই মুসলমান রাজচরিত্রগুলিকে তিনি নতুনভাবে মূল্যায়ন করলেন। 'পদ্মিনী' নাটকের 'আলাউদ্দিন' 'আলমগীর' নাটকে 'আলমগীর', 'বাংলার মসনদ' নাটকে 'সরফরাজ খাঁ' ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়-অভিলাষী আদর্শবাদী রাজপুরুষ হিসাবে বর্ণিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক রচনার কাল বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সমৃদ্ধি

পর্বের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এমনকি তার পরেও তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এর দেখা মেলে। যেহেতু অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে সমসাময়িক স্বদেশবোধের প্রতিফলন ঘটানই তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যরচনার সমান্য ধর্ম, সেহেতু শেষ পর্যায়ের দু-একটি নাটক ছাড়া তাঁর দীর্ঘ ইতিহাস নাট্যের ধারা পূর্বাপর প্রায় একই রকম, শেষ পর্যায়ের নাটকে স্বদেশবোধের সঙ্গে অন্তর্মুখী চরিত্র-চিত্রণের একটি আদর্শও দেখা গিয়েছে। 'আলমগীর' তার উদাহরণ। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকাও তখন পরিবর্তিত। ইংরেজদের বিভেদনীতির প্রয়োগে আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবার হীন চক্রান্ত যেমন দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট, তেমনি এর কুফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষও প্রকটিত হতে শুরু করেছে। ১৯১৮ তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই ভারতবাসী এই যুদ্ধের ফলভোগ করেছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করে বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের কোনো আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করলেন না, উপরন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে আরও কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিলেন। ভারতরক্ষা আইন উঠিয়ে দিলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সভাসমিতির অধিকার হরণের জন্য 'রাওলাট অ্যাক্ট' জারি হয়। শুরু হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ।

এই অবস্থার মধ্যেও নাট্যকারেরা তাঁদের জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁদের দেশপ্রেমে ভাঁটা পড়েনি। তবে লক্ষণীয় এই সময় বেশীরভাগ নাট্যকার তাঁদের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর বাণী যেন অনেক বেশী স্পষ্ট করে প্রচার করতে লাগলেন। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ১৯০৬-এর নভেম্বরে মুসলিম্ লীগ্ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। রাজনৈতিক মঞ্চে নানাভাবে আপোষের চেষ্টা সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়েই চলে। ফলে ১৯১৪—১৯২২ এই পর্বের নাটক মূলতঃ ভিত্তি করেছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির উপর। এই পটভূমিকায় স্বভাবতই অন্যান্য নাট্যকারদের মতো ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁর নাটকের মুসলমান নায়কদের নতুন বিশ্লেষণে উপস্থিত করলেন। ইতিহাস সমর্থিত আওরঙ্গজীবের তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষ মুছে দিয়ে যুগ-চাহিদা অনুযায়ী তার

মুখে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। অত্যন্ত সচেতনভাবেই নাট্যকার নাটকের নায়ক আলমগীরের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে গোপন করে সমকালীন জাতীয় চেতনার উন্মেষের তাগিদে বা প্রয়োজনে এই চরিত্রের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কামনা আরোপ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে রাজপুত বীরত্বের কাছে মোগল সম্রাটের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে সম্রাটের সাম্প্রদায়িক সত্তার পরাজয় ঘটেছে। আবির্ভাব ঘটেছে এক সৌভ্রাতৃত্ববাদী নতুন জীবনের।

— দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ প্রচার ধর্মী বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের পরিচয় —

এই যুগচাহিদার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় মুখ্য-গৌণ সকল প্রকার নাট্যকারের আবির্ভাব। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশীয়ানার প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী হলেও সেগুলির মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতিফলন অবশ্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর বিশিষ্ট আদর্শ এবং সমকালীন উন্মাদনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর জীবনচরিত আলোচনায় দেখা যাবে, যে কারণে এই স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই বঙ্গচ্ছেদে দ্বিজেন্দ্রলালের আন্তরিক পক্ষপাতই ছিল। কেবলমাত্র অনতিক্রম্য যুগ উন্মাদনার বশেই তিনি ঐ ভাবের যোগ্য বাহন 'ঐতিহাসিক নাটক' রচনায় প্রবৃত্ত হন। বরং একথাও বলা যাবে যে, 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে দেশপ্রেমের অতিরিক্ত যে মনুষ্যত্বের উদ্ধার ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী উচ্চারিত হয়েছিল সেই জাগ্রত অভীপ্সাই দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক নাট্যরচনায় প্রকাশিত। যুগরুচি অনুযায়ী স্বাদেশিকতার আদর্শ এবং জাতীয়হিতবাদী চিন্তা এক বিস্তৃত কালসীমায় তাঁর নাটকে ও নায়ক চরিত্রে ধরা পড়েছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী এই যুগচেতনাকে এক অন্যতর ভঙ্গিমায় ধারণ

করেছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মনিষ্ঠা দ্বিজেন্দ্রলালকে যে আত্মসচেতনতা দান করেছিল তার ফলেই তাঁর নাটকের প্রায় সমস্ত চরিত্রেই তাঁর নিজস্ব কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এবং যুগোচিত উত্তপ্ত আবহাওয়ার সহজ উদ্দামতার অতিরিক্ত কিছুও তাঁর নাট্যঅন্বেষণে খুঁজে পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর নাটকের শৈল্পিক মান ও অভিনয়ের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে ব্যাহত করলেও স্বদেশীযুগের একটি বিশেষ শ্রেণীর আদর্শ তাঁর রচিত চরিত্রগুলিতে রূপ পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যপ্রচার, আত্মঘাতী স্বজাতি কলহ দূরীকরণ, ত্যাগ-প্রেম-মৈত্রী ও কর্মের আদর্শে জন্মভুমির সেবায় নিয়োজন এবং আত্মনির্ভরশীলতার উদ্বোধন মোটামুটি এই চারটি বিষয়ের উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে কমবেশী এই বিষয়গুলিকেই যেমন উদ্বোধিত করেছেন তেমনি অতীতের দূরাচারী পটভুমিকায় এগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছেন। তাই অতীতের কাহিনী হলেও যুগোপযোগী স্বদেশবোধের ব্যঞ্জনায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি উজ্জ্বল।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যেমন একটা স্পষ্ট বিবর্তন চোখে পড়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেও একটা স্পষ্ট বিবর্তন চোখে পড়ে। প্রথম স্তরে 'তারাবাঈ' (১৯০৩), এটিকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার রূপরেখার পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হিসাবে ছেড়ে দিলেও দেশাত্ববোধের তাগিদে বীর রমণীর কাহিনীর নাট্যরূপ দেবার আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করতেই হয়। পরবর্তী স্তরে প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসাময়িক তাই জাতীয় উন্মাদনার প্রচার এতে প্রবলতর। তৃতীয় পর্যায়ে স্বাদেশিকতার উন্মাদনা স্তিমিত হওয়ার ফলে নাটকের সূক্ষ্ম শিল্পকলা ও সঠিক চরিত্রায়ণের প্রতি নাট্যকারের মনোযোগ লক্ষ্য করা গেছে। জাতীয় ভাব একেবারে নেই বললে ঠিক হবে না। 'মেবার পতনে' দেশপ্রীতি তথা বিশ্বপ্রীতির সুরই প্রধান। তবে মানবপ্রীতি দেশপ্রীতিকে ছাপিয়ে গেছে। 'দুর্গাদাস' নাটকে বঙ্গব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের আবহাওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রেরণা সঞ্চারিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ইংরেজ সরকার অনুসৃত Divide and Rule Policy-র

মোকাবিলায় অন্যান্য জাতীয় নেতাদের সঙ্গে এক হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালও সাম্প্রদায়িক ঐক্যাদর্শ প্রচারে তৎপর হন। তাই তাঁর নাটকে জাতীয় 'মহাজীবন সংগঠন' চিন্তা যুগপ্রভাবের অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে চিত্রিত হবে এতে আর সন্দেহ কি। হিন্দু-মুসলমানের মিলন বাণী প্রচারিত হয়েছে দুর্গাদাসের আচরণে, বক্তব্যে এবং মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ, কাশিম ইত্যাদি উদারচেতা মুসলমান চরিত্রের মাধ্যমে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক এবং নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, একটি বিশেষ যুগের জাতীয় চেতনা ও আদর্শ এদের মধ্যে সংহত রূপে প্রকাশিত। জাতিসংগঠক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিভিন্ন নায়কদের মধ্য দিয়ে দেশাবাসীকে স্বদেশ চিন্তা ও দেশাত্মবোধের চেতনা দান করতে এগিয়ে এসেছিলেন। শুধু রাজনীতির তরল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়, দেশের প্রতি জাগ্রত সুগভীর ভালবাসাকে তিনি সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বমানব-মৈত্রীর মুক্তাঙ্গনে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বাধীন চিত্ততার উদ্বোধন ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন শিক্ষা তাঁর সৃষ্ট নায়ক চরিত্রগুলির কাছ থেকে সে যুগের মানুষ লাভ করেছিল। ফলে চরিত্রগুলি নাট্যশিল্প মন্ডিত না হয়ে দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচারের আধার স্বরূপ হয়ে প্রকাশিত হলেও এগুলির আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বৃটিশ শাসকের অপছন্দের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার প্রমাণ 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন' নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ রাখার সরকারী নির্দেশ ছিল —

> "The palys are not seditious, but tend to promote hatred between Hindus and Muhammadans and fall within section 153, Indian penal code and the press act. "Pratap Singha", "Mewar Patan" and "Durgadas" have been written by Mr. D.L. Ray, a Deputy Magistrate and it is improbable that he intended by these writings to put class against class. It will probably be sufficient to tell the author to withdraw the

book from circulation and to direct the police to prohibit the performance of the plays in Bengal and East Bengal Districts".

এই আদেশ প্রচারের পিছনে তৎকালীন গোঁড়া মুসলিম সমাজেরও সমর্থন ছিল, তবে যে কারণ দেখিয়ে বৃটিশ সরকার এই নাটকগুলির অভিনয় নিষিদ্ধ করেছিলেন তা শুধুমাত্রই ছিল অজুহাত। বিদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার যে আহ্বান এবং মনুষ্যত্বের নবচেতনা জাগরণের যে আকাঙ্ক্ষা নাটকগুলিতে সংগুপ্ত তা ইংরেজ সরকার সহজেই উপলব্ধি করেছিল। তাদের আদেশনামায় এই আতঙ্কের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। বলা বাহুল্য এই বিরোধিতা সত্ত্বেও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশপ্রেম ও উদার বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির নায়ক ও বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রচারিত করতে পেরেছিলেন এবং বাঙলা ও বাঙালীকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত এক উচ্চতর ভাবদর্শে প্রতিষ্ঠিত বীর, দেশপ্রেমিক, মহৎ নায়কদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। দেশবাসীকে মহাজাতির মন্ত্রে দীক্ষিত করার সাধনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের নায়কদের ভূমিকা অসাধারণ।

— সমসাময়িক অপরাপর গৌণ নাট্যকারগণের পরিচয় —

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারায় এরপর যে সকল নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় তাঁরা অধিকাংশই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যধারাকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রাখীবন্ধন' বা 'অযোধ্যার বেগম' যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর ঐতিহাসিক নাটক 'দিগ্বিজয়ী' নাদির শাহের দিগ্বিজয় অবলম্বনে রচিত হলেও নাদির শাহের দিল্লী নগরীতে অবাধ লুণ্ঠন, অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদির তাৎপর্য এই যে—নিশ্চেষ্টতা বা আবেদন নিবেদন দ্বারা দেশরক্ষা হয় না, শক্তি

মত্ততা ও তৎপ্রসূত অত্যাচারের প্রতিবাদেই দেশবাসীকে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। উন্মাদনা শান্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে। এর মধ্যে চরকাকাটা ও খদ্দর প্রচার হল প্রথম কাজ। বাঙালী নাট্যকারেরাও এই ডাকে সাড়া দিয়ে নাটক লিখতে শুরু করলেন। নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর 'অশোক' নাটকে গিরিশের 'অশোকে'র অলৌকিকতা বর্জন করে তার মানবিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের সত্যতাকে যথাযথ অনুসরণ করাই ছিল তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকের মূলধর্ম। যে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা থেকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জন্ম, পরবর্তী শতাব্দীতেও সেই ধারাই অনুসৃত হল। শুধু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পটভূমিতে সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর মনে যে ত্যাগ ও অহিংসা মন্ত্রের সুর অনুরণিত হল সেই সুরই নাটকে ধ্বনিত হতে থাকল।

— শচীন সেনগুপ্ত ও তাঁর প্রচারধর্মী ঐতিহাসিক নাটক —

এই পরিবর্তিত ধারার এক উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি নাট্যকাহিনীতে ইতিহাস সংস্থাপনে তৎকালীন স্বাধীনতা স্পৃহার তথা দেশপ্রেমের সঙ্গে নর-নারীর ব্যক্তিগত প্রেম প্রীতিকে মিশিয়ে দিয়েছেন। শচীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে 'প্রচারধর্মী নাট্যকার' বলে অভিহিত করেছেন। তাই তাঁর নাটকগুলি এতটাই সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত যে তাদের নায়কেরা দেশ কালের গন্ডী অতিক্রম করে অনায়াসে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের জাতীয় নায়কে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'গৈরিক পতাকা' নাটকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ডাকে আসমুদ্র হিমাচল সর্বস্তরের মানুষের ভেদাভেদ ভুলে সংগঠিত ভাবে বিদেশী ইংরেজ শক্তির ভিত কাঁপিয়ে দেবার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'সিরাজদৌল্লা' নাটকে যে দেশাত্মবোধের জাগরণ লক্ষিত তা পূর্ববর্তীকালে গিরিশচন্দ্র রচিত 'সিরাজদৌল্লা' থেকে পৃথক। কারণ উভয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পটভূমিকার ভিন্নতা ছিল। গিরিশের

নাটক রচনার সময় সমগ্র বঙ্গদেশ ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আলোড়নে উত্তাল। আর পরবর্তী ৩৩ বছরে জাতীয় রাজনীতির ও আন্দোলনের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিয়েছিল। ভাবোন্মাদনা কমে গিয়ে আন্দোলন এক গভীর রূপ পেয়েছিল এবং গণআন্দোলনের একাধিক জোয়ারে তার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এর উপর দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে একটি বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যস্ততা মুছতে না মুছতেই আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'সিরাজদৌল্লা' নাটকে সিরাজকে এঁকেছেন সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিচ্ছবিতে, এবং তাঁর সিরাজ মূলতঃ ব্যবহৃত সমকালীন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের গভীর সমস্যার অবসান ঘটানর উদ্দেশ্যে, উভয়ের মধ্যে মিলনসেতু রচনার উদ্দেশ্যে। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টি বা স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করা ছাড়াও জাতিগঠনের প্রয়োজনে যে মানবতা, ত্যাগ ও সততার প্রয়োজন তাকেও তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটকে। তাঁর 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নাটকে এক মহাজাতি গঠনের স্বপ্নও উচ্চারিত। যে ঐক্য ভাবনায় দেশবাসীকে জাগরিত করা সেই যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যই উক্ত নাটকটি রচিত। শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক ও নায়ক চরিত্রের পর্যালোচনায় এই সত্য অবশ্যই ধরা পড়ে যে -নানান ভাবনার বৈচিত্র্যে তিনি এগুলির উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন ঠিকই কিন্তু জাতিগঠন ও দেশপ্রেমের অভীপ্সা এবং সমসাময়িক দেশনেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকেই তাঁর নায়করা ও নাট্যকাহিনী বেশি উজ্জ্বল। ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানকে গুরুত্ব না দিয়ে, এদেশের মানুষের অন্তরের জাতীয় অনুভূতি ও ভাবাবেগকেই গভীর অনুশীলনে তিনি প্রচার করেছেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পরাধীন ভারতবর্ষ অনিবার্যভাবেই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। প্রতিবাদে সব প্রদেশেই ভারতীয় কংগ্রেসের নেতারা পদত্যাগ করেন। মহম্মদ আলি জিন্নার রাজনৈতিক আচরণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগ, অন্তরীণ অবস্থায় অন্তর্ধান, ১৯৪২ এর আগষ্ট বিপ্লব, বাংলায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সারা দেশকে দুর্যোগের কালিমায় লিপ্ত করল। এই

পরিপ্রেক্ষিতে সোজাসুজি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় নি। অথচ নিছক নাট্যকলার উন্নতি-মানসে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক নাট্যকারেরা কলম ধরেননি। ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত ছিল। যুদ্ধকালীন বহু বিধি নিষেধ জারী হওয়ার ফলে নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের ধারারই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এই পর্বে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রমুখ নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে সূক্ষ্মভাবে দেশভক্তির প্রচার ও বৃটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রচেষ্টাও তাঁদের নাটকে লক্ষিত। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের যে বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে সৃষ্টি হয়েছিল তার ক্রম ক্ষয় সূচিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার অবসানেই। তবে বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মাঝেই অন্যতর বৈশিষ্ট্যে ও স্বাদে এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া অন্যান্য নাট্যকাররা প্রায়শই ইতিহাসের ছায়ায় সামাজিক বা পৌরাণিক নাটক রচনাতেই আগ্রহী হয়েছেন।

— উপসংহার —

বাংলা নাটকের যাত্রাপথ শুরু হয় সামাজিক নাটক দিয়ে। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে নাটক রচনাও শুরু হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় তার বিশেষ প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হল। আন্দোলনের আদর্শ ও উত্তেজনার তরঙ্গে দর্শকেরা বেশীমাত্রায় ভিড় করেছে নাট্যালয়গুলিতে। ফলে নাটকগুলি হয়েছে সমকালীন ঘটনার প্রচারপত্র। ইতিহাস ব্যবহৃত হয়েছে সুবিধানুযায়ী উদ্দেশ্যমূলকভাবে। নায়কেরা হয়ে উঠেছেন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাদের প্রতিরূপ। যখনই শাসকশ্রেণী নাট্যজগতকে শাসন করতে উদ্যোগ নিয়েছে অমনি নাট্যকার ও মঞ্চ পরিচালকেরা সংযত হয়েছেন। আবার কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে উত্তেজনা বাড়লে তার সুযোগ গ্রহণ করতে

বিন্দুমাত্র দেরী করেননি।

দীর্ঘদিনের এই একঘেয়েমী অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এসে দারুণভাবে নাড়া খেল। বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক তথা জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ৪২ এর মন্বন্তরে যেমন অজস্র মানুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটল তেমনি নৈতিকতারও চরম অধঃপতন সূচিত হল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্বর উপায়ে আন্দোলন দমন করতে লাগল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর অন্তরে বিক্ষোভ, গ্লানি আর অপমানের জ্বালা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ধূমায়িত হতে থাকল। এই পটভূমিতে ঐতিহাসিক নাটক রচনা সহজ ব্যাপার ছিল না। ঐতিহাসিক কাহিনীর একই চর্বিত চর্বন যেমন আকর্ষণ হারিয়েছিল তেমনি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা যখন বাস্তব হয়ে উঠেছে তখন পুরানো সুরে ঐক্যের আহ্বান অবশ্য পরিত্যাজ্য হয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হলো। ফলে এই নতুন চেতনাসম্পন্ন মানুষের মধ্যেই এক শ্রেণী অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী নাট্য প্রযোজনায় অগ্রসর হল। সৃষ্টি হল নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নব-যুগ। যার গোড়াপত্তন হল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমে।

—ঃ—